আচার্য্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অভিভাষণ

১

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৩

আচার্য্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অভিভাষণ

১

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৩

মূল্য আট আনা

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE,
CALCUTTA.

Reg. No. 261R—January, 1933—A.

বিশ্ববিদ্যালয়

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্ত্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেচেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষ্যে নিজের ন্যূনতা প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলঙ্কারগুলি বস্তুত শোভন নয় এবং তা নিষ্ফল। কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাইনে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরুণ, তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্ম্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েচে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারো অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি কর্ম্মটি আমার যে উপযুক্ত, সে বিচার কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারা পূর্ব্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে, তার থেকে অনুমান করা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো একটি নূতন সঙ্কল্পের সূচনা হয়েচে। হয়তো মহৎ তার গুরুত্ব। এই জন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েচি। আমি সাহিত্যিক, অতএব সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েচে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্বেগের বিষয় নয়, বহুদিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, যুক্তি প্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল, সর্ব্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি, কবির কীর্ত্তি কীর্ত্তি-স্তম্ভ নয়, সে কীর্ত্তি-তরণী। আবর্ত্তসঙ্কুল বহু দীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর করে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায় তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসেব আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে।

মহাকালের বিচার-দরবারে চূড়ান্ত শুনানির লগ্ন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটে না, বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচার-সভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরবগম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হোলো। সুতরাং এই রীতিবিপর্য্যয় অত্যন্ত বেশী করে চোখে পড়বার বিষয় হয়েচে। এ রকম বহু তীক্ষ্ণদৃষ্টিসঙ্কুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা কঠোর হোত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে; বাহির থেকে আমি এসেচি আগন্তুক, এই জন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্ব্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে সেই আশ্বাসের আভাস পূর্ব্বেই দিয়েচি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেচি কোনো একটি ঋতু পরিবর্ত্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্য্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ কালে এই

কথাটির আলোচনা করে অন্যের কাছে না হোক অন্তত নিজের কাছে, বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হোলো তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দ্দিষ্ট হয় না, কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এদেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেচে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষ্যে তার বিস্তারিত বিচার অসঙ্গত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এ'কে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কীরকম প্রতিভাত হচ্চে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভর্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অর্থাৎ য়ুনিভর্সিটির

যে-চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ব্যবহার, সেটা সমূলে ও শাখাপ্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ এদেশের সঙ্গে সঙ্গত নয়, এদেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটেনি।

অথচ এই য়ুনিভর্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কাল নির্ণয় এখনো হয়নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভর্সিটির পূর্ব্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য্য আবেগে। তার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্ব্বত্র-পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূতরূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ,

মহাভারতের কাল। দেশে যে-বিদ্যা, যে-মননধারা, যে-ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেচে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎ-প্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্য্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে, এবং তাকে সর্ব্ব-লোকের ও সর্ব্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে, তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বলরূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন মহাভারত নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই

রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্তভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্ম্মেকর্ম্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তারপর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েচে, তার মর্ম্মগ্রন্থি বারম্বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জ্জর, কিন্তু ইতিহাস-বিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্ত্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক-প্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেচে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হোত, তাহলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্ব্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্ব্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে কী একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেচে, এই আর্য্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কীরকম সে নিরন্তর সক্রিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে তা বৈষয়িক। সে রয়েচে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার করে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই যে মহাভারতীয় বিশ্বদ্যিালয়-যুগের উল্লেখ করলেম, সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল, তার কারণ ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চারিত্রস্থষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্ম্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল, এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্ব্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্গতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশীলার বিত্তায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে যে বিত্তার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল, তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্ব্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্ভূত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে-ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, সে-ধর্ম্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল

এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে, সর্ব্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কীরকম সত্য ছিল, কীরকম উদার, কীরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্য্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যা-নিকেতনের বর্ণনা করেচেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই, এর অলঙ্করণ-রেখায়িত শুক্তিবক্রস্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড় আম্র বন, নীলপদ্মে প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল। তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নদধি নয়তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সঙ্ঘের বিস্তার সাধন করেচেন, চারিদিকে উন্নত চৈত্য উঠেচে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভা-গৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারিদিকে বেদী ও মন্দির, স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্ম্মাণে কীরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন— আধুনিক কালে যে-রকমের ইঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত, এখানকার গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার

চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন—এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েচে; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে সকল আচার্য্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন তাঁদের যশ বহুদূর-ব্যাপী, তাঁদের চরিত্র পবিত্র অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্ম্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে-বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের পরে, সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করবার দায়িত্ব ছিল তাঁদের পরে, কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাদের কাছে প্রত্যাশা করেচে। আচার্য্যেরা জানতেন দূর দূর দেশকে জ্ঞান বিতরণের মহৎ ভার তাঁদের পরে; সমুদ্রপর্ব্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার করে বিদেশের ছাত্রেরা আসচে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার পরে সর্ব্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের

পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষ্যে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেচে, ঘোষণা করেচে, ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেচে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকার-চেষ্টা করেছিল তার প্রমাণ পাইনে। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলিনে, কেননা সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্য্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন করে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভাপ্রাচুর্য্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাইনে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না বলেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধূমকেতুর সম্মার্জ্জনী কাজ করেচে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশীলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতি-রক্ষা-চেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্ব্বজনের যে উদার

শ্রদ্ধা প্রভৃত ত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত, সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণউৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কীরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তির বহ্নিশিখা কীরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্‌স্‌ট্‌ বুক্‌ থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ, দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েচে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেচেন এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত আট জন বর্জ্জিত হোত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরূক। লোকের মনে উদ্বেগ ছিল পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে একজায়গায় সমবেত হোত, তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকা-ব্যবস্থায় তারা

পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু জ্ঞানের তপস্যা উপলক্ষ্যে মানব মনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায়নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরব-বোধ, চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েচেন বা সৃষ্টি করেচেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশ-বিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ করে আমাদের মনে করবার সময় এসেচে, যে, মানব ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। বাংলা দেশের পক্ষ থেকে আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য,—নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালী, তাঁর নাম শীলভদ্র ; তিনি বাংলা দেশের কোনো এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সঙ্ঘে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সঙ্ঘ ছিল নানাস্থানে। সেই সকল সঙ্ঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশীলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের "পরিষদ"-এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায় ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হোত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা আলোচনা তর্ক বিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদরচনা করেছিল তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেচে। সেখানে খৃষ্টধর্ম্মের আরম্ভ কালে পুরাতন ধর্ম্মের সঙ্গে নূতন

ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হোলো তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হোলো। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্ররূপ ও বিকৃতরূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন করে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ুরোপের নানাস্থানে আচার্য্য ও ছাত্রদের সঙ্ঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্ব্বাচনের দরকার হোলো। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয় কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্ম্মসঙ্ঘ, তারি সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্ক শাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন dialectic সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই সকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত

অর্থে পৌঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। — য়ুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কীরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তখনকার য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষ-ভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ুনিভর্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটেচে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে-নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্ত্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েচে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্র-বাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের বন্ধন

থেকে মুক্তি পেয়েচে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এই সঙ্গে আর একটা বড়ো পরিবর্ত্তন ঘটেচে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্ত্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে, তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হোলো সর্ব্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হোলো। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায় সাধন হয়েচে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলিত করেচে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হোলো সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হোলো প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্রক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হোলো য়ুরোপের

সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে য়ুনিভর্সিটি যেমন উদারভাবে সকল দেশের, তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটেই হচ্চে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তাহলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না, সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এসিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্ম্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এই জন্যেই সে সকল দেশে সে ধর্ম্ম সর্ব্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেচে, এক একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেচে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেচে।

য়ুনিভর্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ বিশেষ জাতি যে-বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি, গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেচে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়, তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথি-শালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল তার এমন সম্পদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্ত্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই, সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠচে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্য-স্বীকার, এইখানে কৃপণতা ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে য়ুনিভর্সিটির পত্তন হোলো বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজামুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্য্যন্ত দুঃখ পাচ্চি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে, এদেশের দরিদ্র পাড়ায় তারি

একটা ছোট শাখা স্থাপন হোলো। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোনো একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েচে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভর্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদ্ঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমতো ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিককালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্ব্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে আবর্ত্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্চে প্রবহমান চিত্তের লীলা-চাঞ্চল্য। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাহিরের এই চিত্ত-মথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা, সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলচে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলণ্ডের য়ুনিভর্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্‌স্‌ফোর্ডে দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চ্চা স্বীকার করা হয়েচে। চারিদিকে কী ঘটচে, সমাজ কোন্‌দিকে চলেচে সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ুনিভর্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেষ্টর য়ুনিভর্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করচে। বর্ত্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্ম্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্ত্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এ রকম সম্মিলন ঘটতে পারেনি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো—তার চলৎ-রূপ আমরা দেখতে পাইনে। যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্ত্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুব সিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিকরীতির বৈদগ্ধ্য বলে

জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি, জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি, এবং সেই টুক্‌রো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌স্‌ট্‌-বুক্‌ সংলগ্ন আমাদের মন পরাশিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েচে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এই জন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা, অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি, ফর্দ্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজনদরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এ রকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহনেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো

কথনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এই রকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে, শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে স্বষ্টিকার্য্য চলে, এই স্বষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে-ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়; বাজারদরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায়, সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য দুর্ম্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেচে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র

আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক য়ুরোপ আজ যে-বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত, তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানবসমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্দ্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্য্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো করে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মানবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এই জন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেচে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্ব্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বজনের করে তুললে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্ত-প্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজিজানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্চে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কম্‌তি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায়রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র।

এ কথা মানতে হবে জাপান স্বাধীন দেশ। সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেচে সে মূল্য পূরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করেনি। (আর হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্ত-শেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটে তারি দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখচি ফাঁকা মাল-মসলায়।) আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই, কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা নিবারণ ঘটে, লোক-দেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ করে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেচে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায় কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে

রেখেছি, তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবী তার কাছে সার্থক হবে—শ্রদ্ধয়া দেয়ং—দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবর-ভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্ম্মাণ করতে হবে সব প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন, যে, না হবার কারণ তার নিজের শক্তি-দৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা করে সাহস করে শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই

বিলেতের আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে, সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলঙ্কৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সখের জিনিষ হবে, প্রাণের জিনিষ হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্ত্তন হয়েচে এইখানেই। তার প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল, তার মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশ পথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েচে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার

পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন-সেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েচে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেচি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েচে অধ্যাপক; এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসঙ্গত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়ীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেচি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গী, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজি ভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাৎড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে মাস তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্ত্তি হেনরি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। সেক্স্পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস

ব্রাউনের বেরিয়ল আর্ন্ এবং মিলটনের প্যারাডাইস্ রিগেন্ড্ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থগ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্ত্তিমান নোট বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠন-ধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনা শক্তির উৎকর্ষ-সাধন সাহিত্য শিক্ষার আর একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। (ভাষা শিক্ষা সাহিত্য শিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে।) যেমন আর্ট শিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রস-স্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন, তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ বিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্মত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্নিকের পরিচয় ও চর্চ্চাই সাহিত্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্য্যবসিতপ্রায় না হোত আর যদি আমার কর্ত্তব্য হোত ক্লাসে সাহিত্যশিক্ষকতা করা তবে এই আদর্শ অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম শোকাবহ হোত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সঙ্কট কাটিয়ে এসেচি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমতো কর্ম্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দির-দ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূম-মলিন নিশীথপ্রদীপের নির্ব্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নব সূর্য্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্ত্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।